ভগিনী নিবেদিতা ও হিন্দুসমাজ

পূর্বা সেনগুপ্ত

ইতিহাসের ধারাপথে অদ্যাবধি 'হিন্দু' শব্দটি বিতর্কিত শব্দরূপেই পরিগণিত হয়েছে। সনাতন ধর্মভুক্ত মানবগোষ্ঠীকে সিন্ধুনদীর উপত্যকার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে হিন্দু শব্দটির উৎপত্তি। চিরকাল এই ধর্মের উপর আঘাত এসেছে, এই ধর্ম ও দর্শনের দৃঢ় বালুকাবেলায় এক-একটি বিপরীত ধর্ম তাদের দর্শন ও বিশ্বাস নিয়ে আছড়ে পড়েছে বারবার। কিন্তু সেগুলি তাকে সিক্ত করলেও ভাঙতে পারেনি, ক্ষয় হয়নি এই ধর্মের। মধ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত বৈদেশিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে যে-ধর্মবোধ দণ্ডায়মান সেই ধর্মবোধকে এক বিদেশিনী নিজ জীবনে গ্রহণ করলেন তীব্র অনুরাগের সঙ্গে। এর পশ্চাতে কেবল আবেগ ছিল না, ছিল যুক্তির দৃঢ়ভিত্তি। তাঁর কাছে হিন্দুধর্ম ও ভারতবর্ষ ছিল সমার্থক। তাঁর ভারতপ্রেমেরই একটি অংশ হল হিন্দুসমাজের প্রতি আনুগত্য।

উৎস

ভগিনী নিবেদিতার হিন্দুধর্মের প্রতি, হিন্দু সমাজের প্রতি ভালবাসার উৎস তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দ—যাঁকে তিনি 'দ্য সাইক্লোনিক হিন্দু মঙ্ক' পরিচয়েই জেনেছিলেন, শুধু তাই নয়—হিন্দু গুরুরূপেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এ-প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের একটি বর্ণনা তুলে ধরা যেতে পারে। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'মার্কিনে চারমাস' গ্রন্থে জানিয়েছেন, তিনি প্রবাসে থাকাকালীন একবার মিসেস বুলের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন, সেখানে তখন ভগিনী নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র বলেন, ভারতে ব্রাহ্মণ বর্ণই আধ্যাত্মিক গুরুরূপে মর্যাদা লাভ করে। বিবেকানন্দ যতই বিদেশে স্বীকৃতিলাভ করুন না কেন তাঁকে হিন্দুসমাজ গুরুরূপে গ্রহণ করে নেয়নি। এটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভগিনী গর্জে উঠে বলেন, ''তুমি মিথ্যাবাদী। স্বামীজী ভারতে হিন্দু ধর্মগুরুরূপে মর্যাদা লাভ করেছেন। ভারত তাঁকে ধর্মগুরুরূপে স্বীকার করেছে।'' এই কথাগুলি বলে নিবেদিতা আবেগে কেঁদে ফেলেছিলেন।

নিবেদিতার এই আবেগ ভাবালুতা নয়। তিনি হিন্দু সন্ন্যাসীরূপেই গুরুকে বরণ করেছিলেন।

নিবেদিতা গুরুর মুখ থেকে হিন্দুধর্মের তাত্ত্বিক পাঠ নিয়েছিলেন মনোযোগী ছাত্রীর মতো। যখন কার্ল মার্কস তাঁর 'এশিয়াটিক মোড অফ প্রোডাকশন' গ্রন্থে হিন্দুধর্মের প্রতি বিষোদ্‌গার করেছেন, মিশনারিগণও তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে

বলেছেন এ-ধর্ম অতিজাগতিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, এই ধর্ম গোরু ও পুতুলের পূজা করে, নারীকে সম্মান দেয় না, ঠিক সেইসময় ভগিনী নিবেদিতা হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে এমন ধারণা দিলেন যা পাশ্চাত্যে এক তাত্ত্বিক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল, হিন্দুধর্মের মূল প্রাণবস্তু ধরা পড়েছিল বিশ্বের কাছে। সমগ্র পৃথিবী তখন বুভুক্ষুর মতো নতুন জীবনবোধ লাভের আকাঙ্ক্ষী, সত্যের আহ্বান তাদের মনের অন্দরে করাঘাত করছে। বিবেকানন্দ সেই বদ্ধ অবস্থা থেকে সনাতন হিন্দুধর্মের উদার আঙিনায় মানবজাতিকে দাঁড় করালেন। কথামৃতকার শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন 'পাঁচিলের ফোকর'। স্বামীজী সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। বিশ্ববাসী শুনল হিন্দু ঋষির সহমর্মী উদার বাণী :''হে অমৃতের পুত্রগণ! কে বলে তোমরা পাপী?'' নিবেদিতাও মানসকন্যারূপে সেই খোলা জানালার তত্ত্বালোকে আলোকিত হলেন; হলেন অনুরণিত, অনুপ্রাণিত ও নিবেদিত।

স্বামীজীর বক্তৃতা, ক্লাস ও নানা আলোচনার মধ্য দিয়ে ভগিনীর হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ধারণা গড়ে উঠেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলির ভূমিকায় স্পষ্টভাবে তিনি জানিয়েছেন, এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে আমরা কেবল ''জগতের জন্য সাধারণভাবে একটি দিব্যবাণী পাইয়াছি তাহা নহে, হিন্দুধর্মের সন্তানদের জন্য হিন্দুধর্মের একটি সনদও লাভ করিয়াছি। বর্তমান যুগের ব্যাপক অবক্ষয়ের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল এক শৈলদৃঢ় আশ্রয়, যেখানে হিন্দুধর্ম একটি স্থিরভূমি লাভ করিতে পারে; প্রয়োজন ছিল একটি প্রামাণিক আপ্তবাক্য, যাহার মধ্য দিয়া সে তাহার নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে।...

''এই প্রথম হিন্দুধর্ম সমগ্রভাবে এক শ্রেষ্ঠ হিন্দু মনীষার দ্বারা বিবৃত হইল। অনাগত যুগে বহুদিন ধরিয়া যখন হিন্দু ধর্মাবলম্বী কেহ হিন্দুধর্মের প্রমাণ চাহিবে, যখন কোনও হিন্দুজননী তাঁহার সন্তানগণকে শিক্ষা দিবেন পূর্বপুরুষদিগের ধর্ম কি ছিল, তখন প্রমাণ ও আলোকের জন্য তিনি এই গ্রন্থাবলীর উপরই নির্ভর করিবেন।... হিন্দুধর্মের প্রয়োজন ছিল নিজের ভাবাদর্শের সংগঠন ও সামঞ্জস্য-বিধান; পৃথিবীর প্রয়োজন ছিল এমন একটি ধর্মের—যাহা সত্য সম্পর্কে বিগতভী। এই উভয় বস্তুই এখানে পাওয়া গিয়াছে।''

স্বামীজীর ব্যাখ্যায় হিন্দুধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস ফুটে উঠেছিল, যা ভগিনী সম্যকভাবে বুঝেছিলেন। হিন্দুধর্মের বা ভারতীয় সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য যে মৌলিক তা অনুভব করেছিলেন তিনি। স্বামীজীর বক্তৃতাগুলির মধ্য দিয়ে তিনি জেনেছিলেন এমন এক ধর্মভাবনা আছে, যে-ধর্মভাবনা সুখের জন্য ধাবিত নয়, তা শান্তির প্রত্যাশী। আবার ধর্মাচরণের উদ্দেশ্য স্বর্গলাভ বা নরকভীতি থেকে মুক্তি নয়, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য মোক্ষ। সাধনার বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন মত থাকলেও হিন্দুধর্মে একটি কেন্দ্রভূমি আছে যাকে কেন্দ্র করে সমস্ত বৈচিত্র্য একটি লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই কেন্দ্রভূমি হল বেদান্ত বা অদ্বৈতজ্ঞান। ভগিনী জন্মসূত্রে সেমিটিক ধর্মসম্ভূত হলেও এটি বুঝেছিলেন। ফলে ভগিনীর কাছে ভারতবর্ষের, বিশেষত হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দেবদেবী, পুরাণ, লোককথা, পূজাপার্বণ ইত্যাদির রূপটি খুব প্রাঞ্জলভাবে ধরা দিয়েছে। এই বিবর্তনের ধারায় হিন্দুধর্মে কী কী পরিবর্তন ও সংযোজন এসেছে তাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

নিবেদিতা ও হিন্দুধর্মের ক্রমবিবর্তন

'The Master as I Saw Him' গ্রন্থে নিবেদিতা 'হিন্দুধর্ম' নামে একটি নির্দিষ্ট অধ্যায়ের সংযোজন করেছেন। স্বামীজী হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তনের যে-ধারাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন, ভগিনী তা সংক্ষিপ্তভাবে সেখানে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই রচনা এতটাই গভীর ও বিস্তৃত যে

আলোচনাটি একটি পৃথক গবেষণায় পর্যবসিত হবে। ভগিনী প্রথমেই বলেছেন, ''স্বামীজী সর্বদাই হিন্দুধর্মকে এক অখণ্ডরূপে চিন্তা করায় মগ্ন থাকিতেন।'' নিবেদিতা দেখেছিলেন বাংলা তথা ভারতে হিন্দুধর্ম বৈষ্ণব, শৈব ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত। এর সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সৃষ্টিও হিন্দুধর্মের মূল কাঠামো থেকে। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতিকে পাশ্চাত্য একেবারে বিপরীতমুখী বলে জানলেও ভারতবর্ষ জানে হিন্দুদের বিভিন্ন অবয়বগুলি পরস্পর সম্বদ্ধ—একথা বলে নিবেদিতা জানাচ্ছেন, যে তর্কযুক্তিবলে বৈষ্ণবধর্ম ও অদ্বৈতবাদ অবিসংবাদিতরূপে অন্যোন্যসাপেক্ষ বলে প্রমাণিত হয়, তার কোথাও যেন ছিদ্র না থাকে। দুটি যে একই সত্যের ভিন্ন রূপমাত্র এই তত্ত্ব ভাল করে ভারতবাসীকেও বুঝতে হবে। নিবেদিতা এই ক্রমবিবর্তনের ধারাতে একটি আশ্চর্য বিষয় নির্দেশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন বিপরীতমুখী দুই ভাবপ্রবাহ ঠিক প্যাঁচের মতো করে একের পর এক গড়ে উঠেছে। কিন্তু তাদের একটি কেন্দ্র আছে যা ধ্রুবসত্য, যাকে কেন্দ্র করে তারা বিপরীতভাবে আবর্তিত হয়ে চলেছে। নিবেদিতা বলছেন, ''হিন্দুধর্ম চিরকালই দুটি spiral বা প্যাঁচের দ্বারা গঠিত—তাদের বেড়গুলি বিপরীতমুখী; একই অক্ষ বা মেরুদণ্ড আশ্রয় করে আছে, এবং একটি অপরটির পরিপূরক।

''বৈষ্ণবধর্ম বলে, 'পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী বা সন্তানের জন্য এই যে প্রচণ্ড ভালবাসা, এসব ঠিক! ... যদি কেবল তুমি ভাবতে পার যে, কৃষ্ণই তোমার ঐ সন্তান, এবং তাঁকে আহার করাবার সময় মনে করতে হবে, কৃষ্ণকেই আহার করাচ্ছ।' 'ইন্দ্রিয়গুলোকে নিগ্রহ কর, ওদের দমন কর'—বেদান্তের এই নির্দেশের পরিবর্তে শ্রীচৈতন্যের উপদেশ ছিল—'ইন্দ্রিয়গুলির সহায়তা নিয়ে পূজা কর!' ''[১]

শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে ভগিনী যে-উক্তি করেছেন তা একটু বিশ্লেষণের প্রয়োজন, নইলে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। চৈতন্যদেব ইন্দ্রিয়নিগ্রহের মাধ্যমে সন্ন্যাসের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। কিন্তু তিনি মানবীয় অনুভূতি, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ধারাকে নিজ অঙ্গেই একীভূত করেছিলেন। যেখানে বেদান্ত জগতকে মায়া বলে ঘোষণা করেছেন, জৈনগণ চরম দৈহিক কৃচ্ছ্রতাকে বরণ করে মোক্ষলাভের কথা বলেছেন, বুদ্ধদেব জগতকে দুঃখময় বলে ঘোষণা করে নির্বাণকেই একমাত্র পথ বলে চিহ্নিত করেছেন, সেখানে শ্রীচৈতন্য মানবীয় প্রেমকে দৈবপ্রেমে উন্নীত করেছিলেন। নিবেদিতা সেই অনুভূতি ও প্রেমভাবের কথাই বলেছেন। কিন্তু দুই বিপরীতগামী পথ—প্রেম ও জ্ঞান—একই অক্ষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে, যার নাম 'ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ও তার সঙ্গে মিশে যাওয়া।'

নিবেদিতা জানিয়েছেন সর্বজনগ্রাহ্য হিন্দুধর্মের প্রচারকরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যেমন স্বামীজীর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, ভগবান বুদ্ধের প্রতিও ভক্তিভাব তার তুলনায় কোনও অংশে কম ছিল না। স্বামীজী মনে করতেন, কোনও মনীষীর পূর্ণতালাভের পিছনে আর-এক ব্যক্তির অবদান থাকে। প্রথম জন সূত্রপাত করেন, দ্বিতীয়জন তার সার্থক রূপ দান করেন। স্বামীজী বলতেন, ''বুদ্ধ তাঁহার রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চতত্ত্বে গঠিত দর্শন মহর্ষি কপিলের নিকট প্রাপ্ত হন। কিন্তু যে প্রেম ওই দর্শনে প্রাণসঞ্চার করে, তাহা বুদ্ধের নিজস্ব।''[২] এইভাবে হিন্দুধর্মের তাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ, বিভিন্ন মহাপুরুষের জীবন ও পটভূমিকা ভগিনী স্বামীজীর কাছ থেকে জেনেছিলেন।

সুতরাং নিবেদিতা ভারতের হিন্দুধর্ম বিবর্তনের সচলতাকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং এই সচলতার অন্তর্গত পদ্ধতিটিকে সুন্দরভাবে নির্দিষ্ট করেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, এই সচলতার

কারণ—হিন্দুধর্মে ব্যক্তির নিজস্ব সুখদুঃখকে প্রাধান্য না দিয়ে তাকে সমাজের অধীন করা হয়েছে। সমাজে যাতে সকলের সুখ বজায় থাকে তা-ই করতে হবে। এই মনোভাবের মধ্যে অদ্বৈততত্ত্ব ও সাম্যবাদের প্রভাবও দেখতে পাওয়া যায় (Social Communism)। কিন্তু সমাজ ব্যক্তিধর্ম পালনে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেয়। এখানে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত যে-কোনওভাবে আরাধনা করার সুযোগ আছে—যাকে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিতন্ত্রতা (Spiritual Individualism) বলতে পারা যায়। আবার ইউরোপে সামাজিক ক্ষেত্রে সবাই স্বাধীন, নিজের মত অনুযায়ী চলতে পারে—যাকে সামাজিক ব্যক্তিতন্ত্রতা (Social Individualism) বলা যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত, সেখানে কেউ নিজের ইচ্ছামতো ধর্ম পালন করতে পারে না, সকলেই এক সাধারণ মতকে ও প্রথাকে নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলে, যাকে আধ্যাত্মিক সাম্য (Spiritual Communism) বলা যায়।[৩]

সেই যুগসন্ধিক্ষণে হিন্দুধর্ম দুটি বিষয়ে সমালোচিত হত। একটি—ঈশ্বরের রূপ কী—তিনি সাকার না নিরাকার। দ্বিতীয়ত পূজা-পার্বণ, উপবাস, কৃচ্ছ্রতা, আহার-সংযম—এই বিষয়গুলির তাৎপর্য কী। ভগিনী নিবেদিতা এই বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা করেছেন।

প্রতিমাপূজা ও মানব-উপাসনা

তৎকালে হিন্দুধর্মের বিগ্রহপূজা নিয়ে ইউরোপে মিশনারিদের মধ্যে কম সমালোচনার স্রোত প্রবাহিত হয়নি। নিবেদিতা এ-প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, একবার স্বামীজীর কাছে কতগুলি লোক হোটেন্টটদের জড় উপাসনার নিন্দা শুনতে চান। স্বামীজী উত্তরে বলেন : ''জড়োপাসনা কাকে বলে আমি জানি না।'' স্বামীজী এ-প্রসঙ্গে বলেন, ''দেখছ না, এটা জড়োপাসনা নয়? ওঃ, তোমাদের হৃদয় কি কঠিন! দেখতে পাও না যে, ছোট ছেলেরা ঠিকই করে থাকে! তারা সবই চৈতন্যময় দেখে। ঐহিক জ্ঞানবৃদ্ধি আমাদের বালকের সেই দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করে। কিন্তু অবশেষে উচ্চতর জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা পুনরায় ঐ অবস্থায় উপনীত হই। ছোট ছেলেরা গাছপালা, ইট, কাঠ, পাথর, সব জিনিসের মধ্যে একটা জীবন্ত শক্তি দেখতে পায়। আর সত্যি কি এদের পিছনে কোন জ্বলন্ত শক্তির অস্তিত্ব নেই? এটা প্রতীকোপাসনা, জড়োপাসনা নয়।''[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই প্রতীক উপাসনাকে সার্থক করে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি সেই প্রতীকের সঙ্গে মাতাপুত্রের সুমধুর ভাবের সম্পর্কও স্থাপনা করেছিলেন। কিন্তু তিনিই অদ্বৈত সাধনার চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন এবং তাঁর মুখেই আমরা শুনি : ''প্রতিমায় পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে হয় না?'' নিবেদিতার লেখায় পাই : ''কতবার তিনি (স্বামীজী) আমাকে বলিয়াছেন, 'তোমরা এখনও ভারতবর্ষকে বুঝতে পারনি। যাই বলো, ভারতবাসী আমরা মানুষের উপাসনা করি। আমাদের ঈশ্বর দেহধারী মানুষ।' এস্থলে তিনি সেইসব আত্মদর্শী মহাপুরুষদের কথা বলিতেছিলেন—যেমন বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, গুরু বা মহাপুরুষ। অন্য এক সময়ে তিনি 'মানব' শব্দটি সম্পূর্ণ পৃথক অর্থে ব্যবহার করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'এই মানব-উপাসনার ভাব সূক্ষ্ম বীজাকারে ভারতবর্ষে বর্তমান, কিন্তু কখনো বিকাশলাভ করেনি। তোমাদের উচিত এর বিকাশসাধন। এই ভাবকে কাব্যে, ললিতকলায় রূপায়িত কর। তোমাদের মধ্যযুগের ইউরোপের মতো আবার সেই ভিক্ষুকদের পা পূজা করবার প্রথা প্রবর্তন কর। মানুষের পূজা করবে এমন এক উপাসক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি কর।' ''[৫]

এখানে নিবেদিতা স্বামীজীর কাছে হিন্দুধর্মের যে-ভাবটির শিক্ষা লাভ করেছিলেন তা অভিনব। স্বামীজী মানবপ্রেমের কথা বলেননি—মানব-

উপাসনার কথা বলেছেন। তিনি চেয়েছিলেন একদল 'মানব উপাসক' যারা জীবন্ত ঈশ্বরের পূজা করবে, এর মাধ্যমে কাব্যে, ললিতকলায় উন্নতি হবে, নতুন যুগের সৃষ্টি হবে—যেমন হয়েছিল মধ্যযুগে। স্বামীজীর প্রচারিত কর্মে পরিণত বেদান্তের এ এক রূপ যা নিবেদিতার আলোচনায় পরিস্ফুট। নিবেদিতা তাই স্বামীজীর বাণী ও রচনার ভূমিকায় লিখেছেন, ''তাঁহার উপদেশে নূতন কিছু ছিল না—এ উক্তি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়।... অদ্বৈত-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াও স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মে এই শিক্ষা সংযুক্ত করিয়া দিলেন যে, দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত একই বিকাশের তিনটি অবস্থা বা ক্রমিক স্তর মাত্র, এই বিকাশের চরম লক্ষ্য হইতেছে শেষোক্ত অদ্বৈত তত্ত্ব।... বহু এবং এক—একই সত্তা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় মনের দ্বারা অনুভূত একই সত্তার বিভিন্ন বিকাশ।... ইহাই আমাদের গুরুদেবের জীবনের চরম তাৎপর্য, এইখানেই তিনি যে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকেন্দ্র হইয়াছেন, তাহা নয়, অতীত এবং ভবিষ্যতেরও। বহু এবং এক—যদি যথার্থই এক সত্তা হয়, তাহা হইলে শুধু সকল উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি—সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা। তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক—এই ভেদ আর থাকিতে পারে না। কায়িক পরিশ্রম করাই প্রার্থনা; জয় করাই ত্যাগ করা, সমগ্র জীবনই ধর্মকার্য হইয়া যায়।'' ভগিনী তাই হিন্দুধর্মের ক্ষুদ্র আচারগুলিকেও মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং বিশ্লেষণ করেছিলেন নিপুণভাবে।

হিন্দুর পূজাপার্বণ ও ভগিনী নিবেদিতা

হিন্দুধর্মের তাত্ত্বিক ক্ষেত্রটি সম্বন্ধে ভগিনী যেমন সম্যকভাবে অবগত ছিলেন ঠিক তেমনই নানা পূজা পার্বণ, ধর্মীয় উৎসবগুলি সম্বন্ধেও তাঁর আগ্রহ ছিল। তিনি একটি প্রাচ্য গৃহের উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন নিখুঁতভাবে। এগুলি তাঁর গবেষণা ও মননশীলতার ফসল। নিবেদিতা সেই গৃহের বর্ণনা দিয়েছেন : দুই উঠোনওয়ালা একটি বাড়ি যার জানালা দিয়ে নক্ষত্র দেখা যায়। সামনের গলি পরিষ্কার, এঁকেবেঁকে গিয়েছে, পাশে বস্তি, মাটির বাড়ি; নারকেলগাছের তলায় যেন স্তূপ করা। রয়েছে নিম, বট, তালগাছ। ভিক্ষুকেরা এসে দাঁড়ায়, পাখিদের ঝটফটানি, রাতে ছাদ কতই মনোরম, সেখান থেকে গঙ্গা দেখা যায়। এই পরিবেশের মধ্যেই তিনি দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী, সরস্বতীপূজা, রাস উৎসব ও দুর্গাপূজা সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন আমাদের উৎসব আবর্তিত হয় চন্দ্রের গতিপথের উপর নির্ভর করে। বছরের প্রতিটি পূর্ণিমায় কিছু না কিছু উৎসব নির্দিষ্ট করা আছে। অমাবস্যাও পুণ্যতিথিরূপে পরিগণিত। এই পূজাপার্বণের বিষয়টি এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যাতে গৃহবন্দি গৃহবধূগণ তা অনায়াসে উপভোগ করতে পারেন। তিনি এ-প্রসঙ্গে রাসপূর্ণিমার আলোচনা করেছেন : ''প্রত্যেক মানুষ, এমনকি গৃহবন্দী মেয়েরাও যাতে বছরের পরিবর্তনশীল সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে, তার সুযোগ দেওয়ার কথা হিন্দুধর্ম কত ভালভাবে বুঝেছিল। সব মাসের মধ্যে এত সুন্দর পূর্ণিমা আর হয় না। শীতের প্রথম মাসের এই পূর্ণিমা। বৃষ্টি থেমে গেছে, মা দুর্গার উৎসব শেষ হয়েছে, এবার শুরু হয়েছে অরণ্য ও চারণভূমির জীবন। এ সময়ে যমুনার তীরে রাখালদের মধ্যে বাসরত ভগবান কৃষ্ণ গোকুলের গোপ-গোপীদের সঙ্গে গোরু নিয়ে বৃন্দাবনের মাঠে যেতেন। বছরের এ সময়ে শুরু হত খেলা ও বিজয়,... ভারতীয় কৃষকদের কাব্যগাথা, ভারতীয় হেরোক্লিসের মহাকাব্য।''[৬]

নিবেদিতা রাস উৎসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ

দিয়েছেন। কীভাবে তিনদিন আগে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ মন্দির থেকে রাসমণ্ডপে নিয়ে যাওয়া হয়, কীভাবে পুরোহিতেরা পাহারা দেন। রাতের সুন্দর চাঁদের আলোয় মেয়েরা পুজো দিতে আসে। একটি লোকগীতির উল্লেখও তিনি করেছেন, যার ভাবটি : ''তার বাঁশি যখন ডাকবে তখন আমায় যেতে হবে!... যেভাবেই হোক, আমাকে যেতেই হবে।... পথ যদি হয় কাঁটায় ভরা, তবুও যাব।... পথের মাঝে পড়ে গেলে চলবে না!'' জন্মগতভাবে নিবেদিতা খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। সেমেটিক ধর্মে ঈশ্বর অভিভাবকস্বরূপ, তাঁর কাছে নত হওয়া যায় কিন্তু তাঁকে ভালবাসা বা প্রেমাস্পদ করে তোলা যায় না। অথচ বৈষ্ণবদের ভাব নিবেদিতা অনায়াসে বুঝতে পেরেছেন। আবার ভক্তের দৃষ্টির সঙ্গে জ্ঞানীর দৃষ্টির বিশ্লেষণেও তিনি অতি অনায়াস ও স্বচ্ছন্দ। রাস উৎসবের বর্ণনার উপসংহারে তিনি বলেছেন, ''যারা ভাবে রাসমেলা বছরে একবার এসে ফুরিয়ে যায় তারা মূর্খ! জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জীবনই হল যমুনাতীরের অরণ্য। সেখানেই প্রভুর বাস। তিনি আনন্দের খেলায় মধুর দিনগুলি ভরে রাখেন এবং জীবাত্মাকে গোপন আনন্দের উচ্চতর শিখরে নিয়ে যান।''[৭]

বৈষ্ণবদের তাত্ত্বিক দিকটির মতো ভগবান বিষ্ণুর অবতার রাম ও কৃষ্ণকে ঘিরে উৎসবগুলির প্রতিটিতেই নিবেদিতার বিশেষ আকর্ষণ দেখা গিয়েছে। দোলযাত্রা নিয়ে তিনি লিখেছেন : ''ফাল্গুন পূর্ণিমার সুন্দর রাতে—যখন অশোক আর আম গাছে ফুল ফোটে, যখন নীল আকাশের নিচে বাদাম পাতার দীর্ঘ, পাতলা কুঁড়ি দেখা দেয়, পাতাবিহীন ডালে পলাশের লাল ফুল ফুটে ওঠে, —তখন আসে প্রাক হিন্দু কোনো প্রাচীন জাতির হোলি উৎসব বা দোল যাত্রা।''[৮] দোলযাত্রার সঙ্গে তিনি বিদেশের ভ্যালেন্টাইন ডে-র তুলনা করেছেন। আদিম অনার্যদের উৎসব থেকে ধীরে ধীরে তা রাধাকৃষ্ণের মিলন উৎসবে পরিণত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে কামদেবের পঞ্চশর আর আমের মুকুলের সুগন্ধে বাহিত বসন্ত উৎসবও নিবেদিতাকে মুগ্ধ করেছে; আবার এই দোল উৎসবের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের জন্মদিন একীভূত হয়ে দিনটিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। নিবেদিতা লিখেছেন, ''প্রাচীন দেশ সম্বন্ধে আমরা আর কিছু না জানলেও একটা জিনিস জানি যে সব দেশেই প্রেমের দেবতার বাৎসরিক পূজা হত। উপরন্তু, সব দেশের আবহাওয়া ও ভৌগোলিক পরিবেশ থেকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীও বুঝতে পারি। বুঝতে পারি যে নিশ্চয় এ উৎসব সর্বত্র বসন্তকালে হত। কোথাও মেলা, কোথাও ফুলের লড়াই, কোথাও বা মে ডে-র উৎসবের মধ্যে রয়ে গেছে এর স্মৃতি। ওরা কোন্ পথে চলত, তা এই স্মৃতিই ভবিষ্যৎ যুগকে বলে দেয়। ভারতে একের পর এক স্তরীভূত ভূতাত্ত্বিক যুগের মত সব যুগ বেঁচে আছে। এখানে এই উৎসব আজো সেভাবেই হয় যেভাবে হত অ্যাসিরিয়া বা মিশরে, প্রাচীন গ্রীস বা হিটাইটদের রাজ্যে।''[৯]

এখানে ভগিনী কি বলতে চাইছেন যে গ্রিস বা হিটাইট সভ্যতার আদিম অবস্থায় যেভাবে এ-উৎসব পালিত হত এখনও তার রূপ একইরকম আছে? কিন্তু ভারতে তা পরিবর্তিত হয়েছে। এখনও উপজাতিদের মধ্যে একরাত্রের আনন্দ উৎসব পালিত হয়। একটি-একটি উপজাতির এক-এক রকম উৎসবের ধরন—মহুয়ার দিনে শালগাছের নিচে দোলনায় দোলে মেয়েরা। কিন্তু এ-উৎসব অন্যত্র ধীরে ধীরে সংস্কৃতিমনস্ক হয়েছে, বিবর্তন ঘটেছে তার। সব থেকে বড় ব্যাপার, এই প্রেমের উৎসব একটি আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। যেমন শ্রীচৈতন্যের জন্মদিন যা রাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রা। এই বিবর্তনের ধারার প্রতিটি পর্যায়ই ভারতের কোনও না কোনও স্থানে পালিত হয়। নিবেদিতা বিভিন্ন সামাজিক প্রথা ও উৎসবের

ক্ষেত্রে এই বিবর্তনের মূল বক্তব্যকে স্থাপন করতে চেয়েছেন। ভারতে যুগপরিবর্তন ও বিজ্ঞানমনস্কতার সঙ্গে সঙ্গে প্রথাগুলির পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু নতুন ধারাকে গ্রহণ করা সত্ত্বেও প্রাচীনকে পরিত্যাগ করা হয়নি। সেই প্রাচীন প্রথাও রয়ে গিয়েছে কোনও কোনও অঞ্চলের মানুষের মধ্যে।

সামাজিক প্রথার বিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরই ভারতে বর্তমান, এই মতটি স্বামী বিবেকানন্দের রচনাতে আরও স্পষ্টভাবে পাই। কী করে নিরেট কাঠের চাকা থেকে আধুনিক টায়ারের চাকার সৃষ্টি হল তিনি পরিব্রাজক গ্রন্থে তা দেখিয়েছেন। এও জানিয়েছেন, এই বিবর্তনের প্রথম অবস্থা নিরেট চাকার গড়গড়িয়ে চলা এখনও দেখা যায়। তবে স্বামীজীর মতে সেটা নিরেট বুদ্ধির পরিচয় বটে।

যাই হোক, সামাজিক প্রথা বিবর্তনের প্রতিটি স্তরই উপস্থিত বলে ভারতে এত বৈচিত্র্যের সমাবেশ এবং বিবর্তনবাদের দিক দিয়ে স্বামীজী ও ভগিনী দুজনেই হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্যের ওপর নতুন আলোক প্রদান করেছেন। এ-প্রসঙ্গে নিবেদিতা বলছেন, ''হিন্দুধর্ম শিশুদের খেলার আনন্দকে গ্রহণ করেছে, নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছে, কিন্তু কখনো সমালোচনা বা অবজ্ঞা করেনি। নিম্ন বর্ণের লোকরা ঋতু সংক্রান্ত প্রাচীন রীতি বজায় রেখেছে। মদন-উৎসবের বিশেষ দুটি মূল উপাদান রয়েছে। একটি হল স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীন মেলামেশা, তার সঙ্গে হয়তো একটু অমার্জিত রঙ্গরস থাকে, ইউরোপের প্রাচীন সেন্ট ভ্যালেন্টিন উৎসবের মত; অন্যটা হল, পরবর্তী যুগের উচ্চতর সভ্যতার সামাজিক পার্থক্যকে অবজ্ঞা করে সব শ্রেণীকে একত্র মিলিত করা। আজো নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের হোলিপূজা অনুষ্ঠানে এই দুটি বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে। পরিণতবয়স্ক হিন্দু ভদ্রলোকেরা বলেন, ছোটবেলায় তাঁদের মায়েরা মাথা নিচু করে হিন্দুস্থানী ভৃত্যদের হাতে আবীরের তিলক পরতেন।''[১০]

নিবেদিতা যে-অনুষ্ঠানটির কথা বলেছেন তা প্রাচীন কলকাতার বহু পরিবারে প্রচলিত ছিল। তাঁর পর্যবেক্ষণক্ষমতা ছিল অসাধারণ। যেমন জন্মাষ্টমী উৎসব বর্ণনাকালে তিনি বলেছেন, ''বাংলাদেশের উচ্চবর্ণের মধ্যে নিয়ম হল, প্রত্যেক বাড়িতে একটা ঠাকুরঘর থাকবেই। এখানে শুধু বড় বড় উৎসব পালন করতে দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই মন্দিরে যায়।''[১১] বর্তমানে কম পরিবারে ঠাকুরঘর, কিন্তু আমাদের মন মন্দিরমুখী। নিবেদিতা জন্মাষ্টমী প্রবন্ধের প্রথমেই লিখছেন এ হল 'মহানের জন্মদিন'। নিবেদিতা মন্দিরে যেতে পছন্দ করতেন। নাটমন্দির, শান্ত পরিবেশ, পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণ, আর জনসমাবেশ। এখানে বহু ধরনের মানুষকে দেখা যায়। তাদের বেশিরভাগই মহিলা। মাথায় ঘোমটা দিয়ে নতভাবে মন্দিরে আসে, চুপ করে আনত থেকে পুরোহিতের মন্ত্র শোনে। অনেক সময় মন্দিরে পুরোহিতেরা প্রবচন দেন, সাধারণ মানুষের প্রশ্নে তাঁদের উত্তরগুলো শুনতেও নিবেদিতার ভাল লাগে। নিবেদিতা একটি কালীমন্দিরের বর্ণনা দিয়েছেন। নিবেদিতা যে-অনুষ্ঠানগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন তার প্রত্যেকটিতে তিনি নিজে অংশগ্রহণ করে তবেই তা লিখেছেন। জন্মাষ্টমী ব্রতেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তার একটি অসাধারণ বর্ণনা আমরা তাঁর কাছ থেকে পাই :

''একটা বেদীর সামনে হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠল, আলোর ঝলক দুলে উঠল—ওদিকে বাইরে চেয়ে আছে আকাশের তারা আর মাঝরাতের আকাশের বেগুনী মেশানো কালো রং—এই হল কৃষ্ণের জন্মের পবিত্রক্ষণ।...

''মন্দিরে বেদীর আলোতে এক ওড়িয়া পুরোহিত বসে তালপাতার পুঁথি থেকে পবিত্র জন্মকাহিনী পড়ছে।... আমরা জন্মমুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছি। মন্দির অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কোমলহৃদয় বৃদ্ধ পুরোহিতের স্বর ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। শত শত শতাব্দী পিছিয়ে গেলাম। আমাদের চারদিক ঘিরে ধরল কারাগারের দেওয়াল, আমরা রাজকীয় অপরাধীদের সঙ্গে আবার অপেক্ষা করছি। তাঁরা হলেন, পবিত্র শিশুর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষারত মা দেবকী ও বাবা বসুদেব।"[১২]

নিবেদিতা যখন ভারতে এসেছিলেন তখন ভারত ব্রিটিশশাসিত। হিন্দুর পূজা, আচার, ঘণ্টাধ্বনি, শঙ্খের ফুৎকার, গোসেবা—এসবই ব্রিটিশের কাছে ছিল কুসংস্কার, অর্থহীন আচার। কিন্তু প্রতিটি সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে মানুষের আচার, উৎসব ও প্রার্থনা নির্ভর করে সূর্য বা চন্দ্রের গতিবিধির উপর। নিবেদিতা দেখেছেন পাশ্চাত্যের সন্ন্যাসীরাও প্রহরে প্রহরে মন্ত্র পড়েন। সকালে, দুপুরে, রাতে। এইসব প্রার্থনামন্ত্রের নাম আছে—লাউডস্, প্রাইম, ম্যাটিন্স, টার্স, সেক্সট, ভেসপার্স ও নন্স। এই প্রার্থনা তাঁরা চার্চের মধ্যে রুদ্ধ ঘরের ভিতর বসে পাঠ করেন। কিন্তু এই প্রার্থনামন্ত্রগুলি রচিত হয়েছিল সূর্যের গতিবিধির উপর নির্ভর করে, আর সেই মন্ত্র থেবাইটগণ মরুভূমিতে বাসকালীন অবস্থায় অর্থাৎ প্রকৃতির মাঝে সৃষ্টি করেছিলেন। বর্তমান মিশনারিগণ তা ভুলে গিয়েছে। বিস্মৃত হয়েছে প্রার্থনার উৎসক্ষণ, তাই হিন্দুর প্রকৃতির মধ্যে ধর্মচর্চাকে তারা সমালোচনা করে। তারা বলে এগুলি কুসংস্কার![১৩] নিবেদিতা লিখেছেন, ''ভারতে আমরা প্রকৃতির মধ্যে ধর্মচর্চা করি এবং প্রতিদিন দেশের জন্মের মহৎ ঘটনাবলীকে নতুন করে উপলব্ধি করি। দুপুরে মাঠে, নদীতে যে নীরবতা নেমে আসে তা কি কেউ অনুভব করেছে? সকালের প্রথম আলোর সঙ্গে গঙ্গার ধারে দূর থেকে যে বাঁশির সুর ভেসে আসে, কে তা বহুক্ষণ ধরে শুনেছে? গোধূলিতে মাঠে-বনে ঘুরে ঘুরে কি কেউ গোধূলির আকস্মিক স্পর্শ হৃদয়ে অনুভব করেছে, অথচ বুঝতে পারেনি যে কেন নির্দিষ্ট সময়ে গ্রামে ঘণ্টা বাজে এবং প্রার্থনা শুরু হয়? কারণ একজনের চোখে যা কুসংস্কার, আরেকজনের কাছে তা হয়তো বিশ্বাসের প্রবল অনুভূতি। তবে হিন্দুধর্মের সব পূজার মধ্যে মাঝরাতে অনুষ্ঠিত পূজাই হল সবচেয়ে প্রভাবশালী।"[১৪]

ভারতে দিনের সন্ধিক্ষণগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাত শেষ হয়ে উষার আবির্ভাব হচ্ছে, সকাল শেষ হয়ে অপরাহ্নের সূচনা হচ্ছে বা গোধূলির পরে সন্ধ্যা প্রস্তুত হচ্ছে রাত্রির জন্য। সুতরাং সূর্যের দৈনিক গতিপথ ও প্রকৃতিকে নিয়েই আমাদের আরাধনার নিয়ম গড়ে উঠেছে। কিন্তু জগৎ শান্ত হলে রাত্রিই আরাধনার প্রকৃষ্ট সময় বলে আমরা মনে করি। একজন খ্রিস্টান মিশনারি চার্চে বসে যে-প্রার্থনা করেন সেটি যেমন সূর্যেরই গতিপথ ধরে মরুভূমিতে সৃষ্টি হয়েছিল ভারতে তা নদী উপত্যকার কাব্যিক পরিবেশে সৃষ্টি হয়েছে। তফাৎ মাত্র এটাই। কিন্তু উৎসক্ষণটি না জানার জন্য আমরা সহজেই সমালোচিত হই বা সমালোচনা করি। নিবেদিতার হিন্দু সমাজচিন্তা ছিল এমনই গভীর ও প্রাঞ্জল।

নিবেদিতার আলোচনায় পূজাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে দেবী সরস্বতীর পূজা। এক্ষেত্রে তিনি কেবল পূজা পর্যবেক্ষণই করেননি, নিজের স্কুলে পূজা সম্পন্নও করেছিলেন। তখন তাঁর মনে হয়েছিল ইংরেজি বড়দিনের আনন্দময় পরিবেশ সারা বাড়িতে ছড়িয়ে আছে, গাম্ভীর্যপূর্ণ পূজায় তার চরম প্রকাশ। পূজার সময় বিদ্যাদেবীকে আহ্বান জানিয়ে প্রার্থনা করা হয় তিনি যেন সারা বছর এই গৃহে থাকেন। নিবেদিতা বলছেন : ''ঐশ্বরিক জ্ঞান সম্বন্ধে মানুষ অনেক কল্পনা করেছে, কিন্তু তার কোনোটিই বাংলার সরস্বতী পূজার মত এত মর্মস্পর্শী নয়। এক অনাড়ম্বর তপস্বিনী, সাদা পদ্মের ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন, চারদিকে ফুল, সব কিছুই সাদা, বর্ণহীন,

নিরলঙ্কার হাতে রহস্যময় বীণা, হাতের স্পর্শে সেই বীণা থেকে বেরিয়ে আসছে গোপন সঙ্গীত—ইনিই আমাদের অতিথি। দাক্ষিণাত্যে ও মহারাষ্ট্রে ইনি ময়ূরে চড়ে থাকেন। এই সুন্দর মূর্তি, সৌখীন পোশাক এবং মুকুটের মত চুলে কম আকর্ষণীয় নয়। কিন্তু বাংলার দেবী যেন বিধবার মত—ঠিক বিধবা নন, কারণ তাঁর পূজার অর্ঘ্যের মধ্যে সধবার হাতের লোহা থাকে—ইনি যথার্থ তপস্বী কন্যা এবং দরিদ্র ছাত্রদের দেবী, এঁর ভগিনী সৌভাগ্যদেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে এঁকে গুলিয়ে ফেলা অসম্ভব।"[১৫]

পুরাণ

বাগবাজারে বাসকালীন নিবেদিতা যেসব উৎসব দেখেছিলেন সেই উৎসবগুলি ছাড়াও হিন্দুধর্মের দেবদেবী ও পুরাণ, মহাকাব্যের কাহিনি তিনি গভীরভাবে অনুশীলন করেছিলেন। 'The Cradle Tales of Hinduism' গ্রন্থটিতে রামায়ণ, মহাভারত, শিবপার্বতী-ধ্রুব-সাবিত্রীর কাহিনি নিবেদিতার কলমে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

মূল মহাভারতের কোথাও নেই এমন একটি ছোট্ট টিট্টিভ পাখির গল্প শুনিয়েছেন নিবেদিতা। এটি নিশ্চয় তাঁর শ্রুত কাহিনিগুলির মধ্যে একটি। কুরুক্ষেত্রের রণ শুরু হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা শোনাচ্ছেন। আর ঝোপের মধ্যে ছোট্ট পাখি ভীত হয়ে প্রার্থনা করে চলেছে, ''হে কেশব! আমার এই ক্ষুদ্র গৃহে ছোট ছোট শাবক সবেমাত্র ডিম ফুটে বের হয়েছে। এত বড় সৈন্যদলের পায়ের তলায় পিষে মৃত্যু হবে তাদের, একমাত্র তুমিই আমাদের রক্ষা করতে পার।" যুদ্ধ শুরু হল, কৃষ্ণ এগিয়ে এসে একটি হাতির গলায় বাঁধা ঘণ্টাটি খুলে নিয়ে সেই পাখির ঝোপটি ঢেকে দিলেন। আঠারো দিনের সেই ভয়ংকর যুদ্ধে সমস্ত কৌরব বংশ ধ্বংস হয়ে গেল কিন্তু ঘণ্টার তলায় ঝোপের মধ্যে শোনা যেতে লাগল পাখির কলরব, তারা জীবিত আছে।

এই সংকলনগ্রন্থে নিবেদিতা এমনভাবে গল্প বাছাই করেছেন যাতে ভারতের সমগ্র সংস্কৃতি পাঠকের অধিগত হয়। বিবাহের সময় পবিত্র অগ্নির সম্মুখে বর-বধূর অঙ্গীকার বর্ণিত হয়েছে। তাদের আঁচল আবদ্ধ করা হয় বিবাহের স্থায়িত্বের কামনায়। সাধারণ নারীরা সোনার অলংকার পায়ে ধারণ করেন না, কারণ দেবী গৌরীর গাত্রবর্ণ যে সোনার মতো! এইরকম নানা খুঁটিনাটি আলোচনা তিনি গল্পকথনের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। রাবণপত্নী মন্দোদরীর ধ্বংসের সামনেও স্থির হয়ে থাকার দৃঢ়তা, রাজা নলের স্ত্রীকে ত্যাগের সময় অন্তরের টানাপোড়েন, ভারতীয় সমাজের মেয়েদের শিষ্টাচার, পুরুষের ভদ্রতা—সবই নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর লেখনীতে। তাঁর বর্ণনা পাঠ করলে বোঝা যায় কী গভীরভাবে তিনি হিন্দুসমাজকে অনুধাবন করেছিলেন।

শিল্প

নিবেদিতার দৃষ্টিতে হিন্দু সংস্কৃতির মতো হিন্দু শিল্পেরও বিশেষ মাত্রা ছিল। স্বামীজীর কাছেই যে নিবেদিতার ভারতীয় শিল্পশিক্ষা তা তাঁর রচনার মধ্যেই উল্লিখিত। কাশ্মীরে থাকাকালে তাঁকে স্বামীজী কীভাবে সেখানকার মন্দিরস্থাপত্য ও ভাস্কর্য বুঝিয়েছিলেন সেই বর্ণনা নিবেদিতার 'দি নোটস অব সাম ওয়ান্ডারিংস উইথ স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে দেখা যায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে নিবেদিতার প্রেরণায় তাঁর অনুপ্রাণিত হওয়ার কথা জানিয়েছেন। ইউরোপীয়দের একপেশে মত—গ্রিক শিল্পের মতো আর অন্য কোনও শিল্প হয়নি—একথা বিবেকানন্দের মতো নিবেদিতাও স্বীকার করতেন না। বৌদ্ধ নগর থেকে জনপথ সবকিছুকে নিবেদিতা শৈল্পিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেছেন। বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য ও শিল্প

তিনি অজন্তা, ইলোরা, কানহেরী ও এলিফান্টা গুহায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন; উদয়গিরি, নালন্দাও বাদ দেননি। ধর্মভাবনার প্রভাব শিল্পের উপর নিবিড় ছাপ রেখে যায়, বৌদ্ধযুগের শিল্প আলোচনাকালে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। তৎকালের উদীয়মান শিল্পী নন্দলাল বসু, অসিত হালদারকে তিনি অজন্তায় পাঠিয়েছিলেন তাঁদের শিল্পীজীবনের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য।

নন্দলাল বসুর একটি বিখ্যাত ছবি 'দশরথের মৃত্যু'। অযোধ্যাপতি দশরথ পুত্রশোকে মৃত্যুশয্যায়, পাশে রানি কৈকেয়ী। তাঁর হাতের পাখাটি তালপাতার। নিবেদিতা ছবি দেখে বললেন, রানি কখনও তালপাতার পাখা ব্যবহার করেন না। তাঁর হাতে থাকবে হাতির দাঁতের কাজ করা পাখা। কোথায় সেইরকম পাখা দেখতে পাওয়া যাবে তিনি তাও বলে দিলেন। শিল্পীর উচিত স্থান-কাল-যুগটির সম্বন্ধে সচেতন থাকা।

মুঘল আমলের শিল্প সম্বন্ধেও নিবেদিতার বহু মন্তব্য দেখতে পাই। ইসলামীয় স্থাপত্য ভারতে এসে ভারতীয় মূল সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, সেই মিশ্রণকে নিবেদিতা গুরুত্ব দিয়েছেন প্রবলভাবে।

তবে তাঁর সর্বাধিক আগ্রহ ছিল লোকশিল্পে। বাগবাজার ঘাটে একদিন একটি মাটির পুতুল দেখে উৎফুল্ল হয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেনকে জানিয়েছিলেন, ঠিক এইরকম পুতুল তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দেখেছেন। শিল্পের প্রতীকী ভাষা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রগাঢ়। তিনি ভাবী স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকার একটি খসড়াও করেছিলেন—লাল রঙের উপর সোনালি রং দিয়ে অঙ্কিত বজ্র। তাঁর স্কুলে সেলাই ছিল মেয়েদের পাঠ্যসূচির অন্তর্গত। নিবেদিতা তাঁতিদের কাছ থেকে হলুদ, সবুজ রঙে ছোপানো কাপড় কিনে আনতেন। তৈরি হত নানা সূচিশিল্প। মিস ম্যাকলাউডকে একটি চিঠিতে লিখলেন, ''ভারতীয় নারীদের মধ্যে যে-ধরনের ডিজাইন চলিত আছে তাদের গভীরভাবে অনুশীলন করছি। দারুণ একটি বিষয়।''

আধুনিক ভারতীয় শিল্প আন্দোলনের মূল নায়ক আর্নেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু প্রমুখ সিস্টারের শিল্পভাবনার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। নন্দলাল বসু ও অসিত হালদারকে তিনি বৌদ্ধযুগের শিল্পের ধারা দিয়ে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনি চিত্রায়িত করার প্রেরণা দেন। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কেও নিবেদিতা উৎসাহিত করেছিলেন দেশীয় শিল্প সম্পর্কে মানুষকে পরিচিত করাতে। কেবল প্রেরণা নয়, নিবেদিতা চিত্রপরিচিতি হিসেবে বহু চিত্রের ব্যাখ্যাও লিখে দেন। নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, অবন ঠাকুর এই প্রবাসী পত্রিকাতেই হিন্দু পৌরাণিক কাহিনিগুলি চিত্রায়িত করতে থাকেন। এগুলির মধ্যে দময়ন্তীর স্বয়ংবর, কৃষ্ণ-সুদামা, জগাই-মাধাই প্রভৃতি বিখ্যাত।

স্বামীজীর সঙ্গে সমুদ্রযাত্রার সময় স্বামীজী নিবেদিতার কাছে সমগ্র পৃথিবী তথা ভারতের ইতিহাস, বিশেষ করে হিন্দুধর্মের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেছিলেন। এর সঙ্গে ভারতের ইতিহাস, পুরাণ, মহাকাব্য, লৌকিক সাহিত্য মন্থন করে শত শত গল্প স্বামীজী শোনাতেন। অন্যত্র স্বামীজী হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যে-গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি বলেছিলেন নিবেদিতা তা ব্যক্ত করেছেন : ''ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের অসংখ্য শাখা-প্রশাখার কোন একটিকেও তাহার গণ্ডির বাহিরে রাখিবার কোনপ্রকার চেষ্টা স্বামীজী আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে—ব্রাহ্ম অথবা আর্যসমাজভুক্ত হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট অহিন্দু বলিয়া গণ্য হইতেন না। তাঁহার মতে শিখদের বিখ্যাত খালসা দলের ন্যায় অতি সুন্দর, সুগঠিত সঙ্ঘ হিন্দুধর্মেরই

সৃষ্টি, এবং উহা হিন্দুধর্মেরই অপূর্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।... তাঁহার মতে, হিন্দুধর্মের তিনটি পৃথক স্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন। তাহার মধ্যে প্রথম হইল—প্রাচীন, ঐতিহাসিক ধর্ম যাহা শাস্ত্রানুবর্তী। দ্বিতীয়—মুসলমান রাজত্বকালে ধর্মসংস্কারগণ কর্তৃক প্রবর্তিত সম্প্রদায়সমূহ। তৃতীয়—বর্তমানকালের সংস্কার-প্রয়াসী বিভিন্ন সম্প্রদায়। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ই সমভাবে হিন্দুধর্মভুক্ত।"[১৬]

স্বামীজী এইভাবে হিন্দুধর্মের ঐতিহাসিক দিক দিয়ে স্তরবিভাজন করেছিলেন। ভগিনী এই বিভাজনকে স্থিরবিন্দুর মতো ধরে নিয়ে হিন্দুধর্মের প্রতি নিজের ভাবনা ও বিশ্লেষণকে পরিচালিত করেছেন। তিনি স্মরণে রেখেছিলেন যে তিনি একসময় স্বামীজীকে জানিয়েছিলেন, হিন্দুদের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা কম। এই কথায় স্বামীজী দুঃখিত হয়ে বলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এর বিপরীত হলেই বোধহয় ভাল হত কারণ এ হল ধর্মভীরুতার লক্ষণ, ধর্মভাবের পরিপূর্ণতার নয়। প্রকৃত ধর্মাচরণ যোদ্ধার মনোভাব তৈরি করে। ব্রতধারীর যে-সাহসিকতা তা বীরত্বের। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে লড়াই জানে সে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে পিছপা হয় না। তাই তো গীতায় দেখি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন। যোদ্ধার ভাবকে ধারণ করে ভগিনী তাই 'আগ্রাসী হিন্দুধর্মের' কথা বলেছেন। স্বামীজী অদ্বৈত বেদান্তকে সম্প্রসারিত করে তাকে 'কর্মে পরিণত বেদান্ত'রূপে যুগোপযোগী করেছিলেন। ভগিনী তারই প্রায়োগিক রূপটি 'আগ্রাসী হিন্দুধর্ম' নামে চিহ্নিত করলেন।

পাশ্চাত্যবাসী হয়ে, ভিন্নধর্মাবলম্বী হয়ে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এত নিখুঁত অনুশীলনকারী ও তত্ত্বদ্রষ্টা ভগিনী নিবেদিতার মতো আর দ্বিতীয় নেই। অসাধারণ মনস্বিনী, তেজস্বিনী, অগ্নিশিখাস্বরূপ নিবেদিতা যুগসন্ধিক্ষণের যজ্ঞভূমি থেকে উত্থিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগমন্থনের যাজ্ঞসেনী—মহান ভারতের হিন্দুধর্মের ইতিহাসে এক বিরল ব্যক্তিত্ব।

তথ্যসূত্র

১। ভগিনী নিবেদিতা, *স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি,* অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০৯), পৃঃ ১২২

২। তদেব, পৃঃ ১২১

৩। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১২৩

৪। তদেব, পৃঃ ১২৪

৫। তদেব, পৃঃ ১২৩-২৪

৬। *নিবেদিতা-সমগ্র,* সম্পাদনা : কাঞ্চন বসু, (রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন : কলকাতা, ১৯৯৫), খণ্ড ১, পৃঃ ২৩৮

৭। তদেব, পৃঃ ২৩৯

৮। তদেব, পৃঃ ২২৬

৯। তদেব

১০। তদেব, পৃঃ ২২৭-২৮

১১। তদেব, পৃঃ ২২৯

১২। তদেব, পৃঃ ২২৮, ২৩০

১৩। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ২২৮

১৪। তদেব, পৃঃ ২২৯

১৫। তদেব, পৃঃ ২৩২

১৬। *স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি,* পৃঃ ১৪৪